## প্রথম অধ্যায়

# অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিজীবন ও প্রাবন্ধিক সত্তার যোগসূত্র

যে কোনো স্রষ্টার সৃষ্টিকে বোঝার জন্য তাঁর জীবনচর্চা জানাটা বোধ হয় জরুরী। কেননা, জীবন চর্চা থেকেই তৈরী হয় জীবনবোধ। আর সেই জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশই হল সাহিত্য। যে কোনো মানুষের জীবনচর্চার সাথে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিজীবন ও চারপাশের পরিবেশ। সেই পরিবেশের মৃত্তিকা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি দিকগুলিও যে কোনো মানুষের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়েরও জীবন আছে, রয়েছে জীবনদর্শনও। কিন্তু কী করে গড়ে উঠল তাঁর সেই জীবন বোধ, জীবনদর্শন। কী করেই বা গড়ে উঠল তাঁর লেখক সত্তা? কোন কোন ঘটনাই বা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, এমন অনেক প্রশ্নই উঠে তাঁর সম্পর্কে। তিনি নিজেই বলেছেন— ''গান্ধীজী বলতেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'। আমি বলি, আমার বাণীই আমার জীবন। আমার বাণীর মধ্যেই আমার জীবন নিহিত।''[১]

তাঁর বাণী অর্থাৎ রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যেই রয়েছে তাঁর জীবনের কথা, জীবন অভিজ্ঞতার কথা, জীবনদর্শনের কথা। তাঁর রচিত প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও পত্রগুলির মধ্যেও তাঁর জীবনদর্শনের কথা উঠে আসে। যেমন, *জীবন যৌবন* (১৯৯৯), *কলেজ জীবনের স্মৃতি* (১৯৮৫), *সাক্ষাৎকার : ধীমান দাশগুপ্ত* (১৯৯০), এমন অনেক গ্রন্থেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের কথা। অন্নদাশঙ্করের নিজের কথায়— ''আমরা ছিলুম একটি পুরাতন শক্ত পরিবারে। আকবর বাদশাহের আমলে আমাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র ঘোষ সুরে ওড়িশা জরিপ করতে যান টোডরমলের সঙ্গে। জাহাঙ্গির বাদশাহের কাছ থেকে 'লাখেরাজ-তালুক' ও 'মান' পদবি পেয়ে ওড়িশাতেই বসবাস শুরু করেন। তার আগে আমাদের বাস ছিল ভাগীরথী তীরে কোতরং গ্রামে। রামচন্দ্রের বংশকে বলা হয় মহাশয় বংশ। কালক্রমে সেটি ছ-টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তার একটির নাম রামেশ্বরপুর। প্রত্যেক শাখার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মহাশয় বলে অভিহিত করা হত। খান পদবির সঙ্গে কবে 'রায়' পদবি যুক্ত হল তার ইতিবৃত্ত আমার জানা অজানা। তবে সেটা মোগল আমলেই হয়।''[২]

লাখেরাজদার হিসেবে তারা কখনও কাউকে খাজনা দেয়নি। ইংরেজকেও না। অন্নদাশঙ্কর রায় দুঃখ করে বলেছেন শরিকদের মধ্যে তালুক এমনভাবে বিভক্ত হয়ে যায় যে ক্রমবর্ধমান উত্তরপুরুষদের ভাগে পরিবার পিছু একখানা বা দুখানা গ্রামের বেশি কিছু পড়ে না। তাই নিয়ে শরিক বিবাদ চরমে উঠে যায়। তারপর পিতামহ শ্রীনাথ রায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দেশান্তরি হন।

''তারপরে আমার পিতা নিমাইচরণ রায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েন ঢেঙ্কানাল দেশীয়

রাজ্যে।”[৩] তারপর নিমাইচরণ বিয়ে করেন কটকের সুবিখ্যাত পালিত পরিবারে। পালিতরা ঘাটাল অবতল থেকে কটকে আসেন ওকালতি ও চাকরি উপলক্ষে। দীনবন্ধু পালিত উকিল হিসেবে খুব নামকরা। যে পাড়ায় থাকতেন সে পাড়ার নাম হয় পালিত পাড়া। কলকাতার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের বাড়ির আবহাওয়াটা ছিল সাময়িক কলকাতার। ভাষা ও গয়না, পোশাক ও কেশবিন্যাস তাঁদেরকে এমনভাবে আলাদা করেছিল যে ঠাকুমা দুর্গামনিতে আর মা হেমনলিনীতে দুটি যুগের ব্যবধান ছিল। ‘‘ঠাকুমা আমার মাতৃকুলকে বলতেন বাংলা বালা অর্থাৎ আধুনিক বাঙালি।”[৪] ‘‘আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় সন্ধ্যাবেলা আমাকে মুখে মুখে সংস্কৃত চাণক্য শ্লোক শেখাতেন। ‘স্বদেশে পূত্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে’ ইত্যাদি একটু একটু মনে পড়ে।”[৫] অর্থাৎ ওড়িশার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালে ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ অন্নদাশঙ্করের জন্ম। পিতা নিমাইচরণ রায়, মা হেমনলিনী। পিতামহ শ্রীনাথ রায় ও ঠাকুরমা দুর্গামনি। রায় বংশ তিনশো বছর ধরে ওড়িশা প্রবাসী। রায়বংশ বরাবরই— শাক্ত মতাবলম্বী। কিন্তু ঠাকুরদার মৃত্যুর পর অন্নদাশঙ্করের বাবা ও মা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। কেননা, ঢেঙ্কানালের আকাশে বাতাসে ছিল বৈষ্ণবীয় রসতরঙ্গ। অন্নদাশঙ্করের তখন সাত আট বছর বয়স। তাঁরা তিন ভাই দুই বোন। প্রথম চারজনের শাক্ত মতে নামকরণ এবং বৈষ্ণব নামকরণ। ছোটবেলা থেকেই দেশ-বিদেশের পুরাণ, উপকথা, রামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্প শুনতেন মা এবং ঠাকুমার মুখে। বাড়িতে হত কীর্তন, জয়দেব-বিদ্যাপতির গান।

বংশে প্রথম ইংরেজ সরকারের চাকরি নিয়েছিলেন বাবা নিমাইচরণ আঠারো বছর বয়সে। নিমাই পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢেঙ্কানাল রাজ্যে রাজার নায়েবের চাকরি নেন। সেখানে ভাইদের ও ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি পড়ান। তাঁর ছিল নাটকে-আবৃত্তিতে কাগজ পড়ায় আগ্রহ। ছিলেন রাজবাড়ির ম্যানেজার। ছেলেবেলায় অন্নদাশঙ্করের পাঠ্যপুস্তকে তেমন মন ছিল না বললেই চলে। খেলাধুলোয়, আচার-অনুষ্ঠানে-মেলামেশায় বেশিরভাগ সময় তাঁর কেটেছে। সংসারের সাথে মিশে সাংসারিক কথাবার্তা সামাজিক মেলামেশা আর মেয়েদের সান্নিধ্য তাঁকে বয়সের তুলনায় পাকা করে তোলে। নারী বিষয়ক বই পড়ে নয়, মিশেই শিখেছেন নারীর রহস্য। তাঁর প্রথম শিক্ষা কীভাবে হল— তাঁর কথাতে শোনা যাক—

‘‘আমার প্রথম শিক্ষা ওড়িয়া পাঠশালা। গুরু মশাই শেখাতেন, ‘কমললোচন শ্রীহরি, করেন শঙ্খ চক্রধারী’ ও কোইলি লো কেশব যে মথুরাকে গলে, বাহুড়িন আইলে লো কোইলি।”[৬]

যাইহোক, ছোট বেলাতেই নিশ্চয় তাঁর মেধার পরিচয় রাজেন্দ্রলাল দত্ত পেয়েছিলেন, না হলে কী করে ঢেঙ্কানালের হাই ইংলিশ স্কুলের পত্রিকা বিভাগের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। পরিচয় ঘটে নানা পত্র পত্রিকার সাথে। লাইব্রেরির আলমারি খুলে অন্নদাশঙ্কর আবিষ্কার করেন

মলাটে তালপাতার ছবি আঁকা এক গাদা পত্রপত্রিকা, নাম 'সবুজপত্র'। তাঁর চোখে পড়ে একটি কবিতার প্রথম পঙক্তি।

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ

আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'[৭]— এই কবিতার মধ্যে দিয়েই— তাঁর উপনয়ন হয়েছে। শুধু *সবুজ পত্র* নয়, *ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী* সহ অনেক পত্রিকা। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়কে *সবুজ পত্র* আকর্ষণ করত। *সবুজপত্রে* থাকতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্প আর ঘরে বাইরে উপন্যাস, প্রমথ চৌধুরীর *চার-ইয়ারি কথা* ও গল্প প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা, অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ। *সবুজ পত্র* থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যিক রুচি, সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা, আর্ট ও স্টাইল সম্বন্ধে ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর দুই আদি গুরু। ''তাঁর শিক্ষানবিশির সেই গুরু। হয়তো কুকুর ছানার মতোই তখনো তাঁর চোখ ফোটেনি, কিন্তু জীবন তাকে শিখিয়ে তুলছে ধীরে ধীরে। প্রথম সাংসারিক অভিজ্ঞতাগুলো, চিত্রবিচিত্র নানা চরিত্র, বই ও খবরের কাগজ থেকে পাওয়া জ্ঞান ও তথ্য— সমস্ত মিলে তাঁকে গড়ে তুলছে। তাঁর জীবনের পথে সেগুলো সবই এক একটা উত্তরণ চিহ্ন, ব্যক্তিত্ব গড়ার উপাদান। জীবনের কাছ থেকেই তিনি শেখেন স্বাধীনতার মূল্য, হিংসার বিরুদ্ধে জাগরণ, ধর্মে-ধর্মে, ধনী-গরীবে, ইংরেজি-বাংলায় ভেদাভেদ-হীনতা। সেই তার জীবন দীক্ষা।''[৮]

১৯১৮ সালের ঘটনা। অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পেয়ে পুরী গিয়ে জেলা স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং সেখানে সহপাঠী কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহীকে পান। যিনি ওড়িয়া সাহিত্যের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক রূপে পরিচিত। কিছুদিন পরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের অসুস্থতার জন্য ঢেঙ্কানালে ফিরে আসেন। কিন্তু এক গণ্ডগোল বাধে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর নিয়ে। ঘোষিত যোগ ফলের তুলনায় প্রকৃত যোগফল বেশি। তাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান পান। তার জন্য তাঁর পুরস্কার মেলে টলস্টয়ের লেখা *টোয়েন্টিথ্রী টেলস* বইটি। তাঁর থেকে একটি গল্প *তিনটি প্রশ্ন* নামে সবুজ পত্র-র চলতি বাংলায় অনুবাদ করেন। এবং প্রবাসী পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। সেইটেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। স্কুলেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তাঁর ভারনাকুলার ছিল ওড়িয়া। কিন্তু ভারনাকুলার পরীক্ষার দিন তিনি ওড়িয়ার পরিবর্তে বাংলা প্রশ্নপত্র পেয়ে বাংলাতেই উত্তর দেন। স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মনোমোহন ঘোষের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন। দুঃখের বিষয় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ঢেঙ্কানাল ফেরার পথে তিনি খবর পান মা মারা গেছেন। ভারতে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজের স্কুল-কলেজ ছেড়ে জেলে আসছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সসম্মানের উত্তীর্ণ হয়ে জলপানি নিয়ে কটক রেভেন্‌শ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে মেলে জ্ঞানীগুণী

অধ্যাপক-শিক্ষকদের সান্নিধ্য। বাংলা, ওড়িয়া আর ইংরেজি— এই তিনটি ভাষাতেই তিনি লিখতেন। কটকে কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, হরিহর মহাপাত্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় মিলে গড়ে তোলেন *সবুজ দল*। এরা *ননসেন্স ক্লাব* ও গড়ে তোলেন এবং 'অবকাশ' নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে ভারতী পত্রিকায় লেখেন *পারিবারিক নারী সমস্যা* নামে একটি প্রবন্ধ। এবং নারীবাদী দৃষ্টি কোন থেকে *নানা কথা* নামেও একটি প্রবন্ধ লেখেন। আর ওড়িয়াতে লেখেন *নরচক্ষুরে নারী* নামে প্রবন্ধ। ফ্লবেয়র, ইবসেন, দস্তয়ভস্কি ডিস্কে, আনাতোল ফ্রাঁস এঁদের লেখাপড়ে তাঁর বিদেশ গিয়ে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা অর্জনের স্বাদ জাগে। তারপর যৌবন থেকেই গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও মহত্ত্ব অন্নদাশঙ্করের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে শুধু সাহিত্যে নয়, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আদর্শ, উপায় এবং দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধ জন্মায়। ১৯২৩ সনে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ.পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাটনা কলেজে চলে এলেন তিনি। পরের বছর রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং জানতে চান— 'Is art too good to be human nature's daily good?"[৯] উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'It is like Higher Mathematics. It calls for Preparation' গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর পাটনায়, প্রথমবার তেমন কথা হয়নি, কথা হয় পরে। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়—''পাটনা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, আর্ট কি প্রতিদিনের খোরাক হতে পারে। তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কি সবাই বুঝতে পারে? টলস্টয়ের উত্তর বিপরীত। 'সবুজপত্র' আমার মাথায় 'আর্ট' শব্দটি ঢুকিয়ে দেয়। প্রমথ চৌধুরীই এর জন্য দায়ী।"[১০]

বি.এ. পড়তে পড়তেই অন্নদাশঙ্কর ও তাঁর সবুজদলের বন্ধুরা মিলে বারোয়ারি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। আর এই সময়েই কলেজে ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রমাঁরোলার এপিক উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফ লাভ করেন। ১৯২৫ সালে বি.এ. ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। অবশ্য এর আগে থেকেই সাংবাদিক হওয়ার লোভ তাঁর ছিল। যাতে করে তিনি আমেরিকায় যেতে পারেন।

অর্থাৎ ''১৯২৩ সাল পর্যন্ত অন্নদাশঙ্কর ভারতের ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি অসহযোগী ও বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং তখন অকল্পনীয় ছিল যে তিনি কোনও সময় ব্রিটিশদের সহযোগীরূপে কোনও চাকরি করবেন। কিন্তু পাটনাতে অধ্যয়নকালে ওড়িয়া সাহিত্যচর্চার সূত্রে তাঁর সঙ্গে একজন বিবাহিতা ওড়িয়া লেখিকার প্রেম হয়। সেই লেখিকা ছিলেন ধনী গৃহের অসুখী বধূ। অন্নদাশঙ্কর হৃদয়ঙ্গম করেন যে এ প্রেমকে সার্থক করতে হলে চাই যথেষ্ট আর্থিক সংগতি ও সামাজিক সুরক্ষা।"[১১] তাই আই.সি.এস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন। কটকে ছাত্রজীবনে প্রচুর ইউরোপীয়

সাহিত্য পড়ে স্বচক্ষে ইউরোপ দেখার একটা আশা তাঁর মনের কোণে জেগেছিল।

গ্র্যাজুয়েশনের পরে সাংবাদিক হবার জন্য কলকাতায় না গিয়ে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। এবং ১৯২৭ এ এই পরীক্ষায় প্রথম হন ও দুবছরের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। এই সময়ই প্রাবন্ধিক আরও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি *কমল বিলাসীর বিদায়* নামে একটি কবিতা লেখে ওড়িয়া সাহিত্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং স্থির করেন বাংলাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করবেন এবং তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, বাঙালি সাহিত্যিক হলে তিনি হবেন বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের উত্তরসূরী। তাঁর ইংল্যাণ্ড গমন যে সাহিত্য সৃষ্টিতে ও জীবন ধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বদেশ ও স্বকালের সমন্বয় ঘটিয়েছে— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুইজারল্যাণ্ডে রোঁলার সঙ্গে দেখা ও কথাও হয়েছিল। অন্নদাশঙ্করের রোঁলা অন্নদাশঙ্করকে বলেছিলেন— নিজের আনন্দের জন্য লিখবেন। শোনা যাক অন্নদাশঙ্করকে নিজের ভাষাতেই— ''ইউরোপে না গেলে আমার মনে হত, জীবন ব্যর্থ। কিন্তু আমেরিকায় যাইনি বলে আমার জীবন ব্যর্থ মনে হয় না, কারণ আমেরিকাই এসেছে আমার ঘরের ঘরনী রূপে।''[১২]

সেই সতেরো বছর বয়সে যদি আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব হত তাহলে এগারো বছর বয়সের অ্যালিস ভার্জিনিয়ার সঙ্গে আমার প্রেমও হত না, বিবাহ হত না। হয়তো আর কারও সঙ্গে প্রেম হত ও বিবাহ হত। কিন্তু লীলার মতো তিনি বাঙালি হতেন না, আমাকেই আমেরিকান করে ছাড়তেন। সেই জন্য বলি, ''বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।''[১৩] বিয়ের পর লীলা বলে আমি তাঁর নাম করণ করি।''[১৪] তিনিই অন্যত্র বলেছেন—

''আমার দু বছরের ইউরোপ প্রবাস আমাকে ছয় খণ্ডে *সত্যাসত্য*, উপন্যাস লেখার উপাদান জুগিয়েছে।''[১৫] এরপর আমরা তাঁর মুখ থেকেই শুনতে পাই পথে প্রবাসের কথা। ''বিলেত যাওয়ার সময় জাহাজেই আমি লিখতে শুরু করে দিয়েছিলুম 'পথে প্রবাসে'। তারপর বিলেতে গিয়ে লিখি। ধারাবাহিক ভাবে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। সমান্তরালভাবে 'মৌচাক' এ প্রকাশিত হয় আমার 'ইউরোপের চিঠি'। প্রথম বছরের ইস্টারের ছুটিতে আমি আইল অব ওয়াইট এ থাকি YMCA-র আবাসে। সেইখানে লিখতে বসি 'তারুণ্য'। শেষ করি লণ্ডনে ফিরে এসে ও পাঠিয়ে দিই এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স এর সুধীরচন্দ্র সরকারকে।''[১৬]

১৯২৯-এ দেশে ফিরে অন্নদাশঙ্কর বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। তাঁর চাকরি জীবনের শুরু। চাকরির ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন বাংলা প্রদেশ। কারণ তিনি বাঙালি সাহিত্যিক হতে চেয়েছিলেন। এই সময়ই জীবনে আসে প্রেম, প্রিয়জনসঙ্গ এবং অবশেষে পরিণয়। বিবাহের

তারিখটি ১৯৩০ এবং ২৩ অক্টোবর, মার্কিন রমণী অ্যালিস্ ভার্জিনিয়া অর্ণডোর্ফ। বিয়েতে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পর মার্কিন রমণীর নাম হয় লীলা রায়। লীলা রায় কবি প্রাবন্ধিক-অনুবাদক এবং সর্বোপরি সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পিয়ানো বাজাতেন বেশ ভালো।

পিতা নিমাইচরণ একবার বলেছিলেন, তাঁর ছেলে জর্জ ওয়াশিংটন হবে। কিন্তু ওয়াশিংটন না হয়ে তাঁর দেশের একটি কন্যাকে বিয়ে করলেন। এবার আমরা আসবো তাঁর চাকরিজীবনের কথায়— ''চাকরিতে অন্নদাশঙ্কর প্রথমে শাসন বিভাগে-রাজশাহী জেলার নওগাঁয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩১-৩৩), চট্টগ্রামে ও ঢাকায় জুডিশিয়াল ট্রেনিং (১৯৩৩-৩৪), বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৪), নদীয়ার কুস্টিয়ায় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৫-৩৬), নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৬), রাজশাহী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৭), চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৭-৩৮)।''[১৭] এই হল তাঁর শাসন বিভাগের কাল।

আবার শাসক হিসাবে তাঁকে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষের সাথে মিশতে হয়েছে। কৃষক, জমিদার, ছাত্র-পুলিশ-অর্জন করেছেন প্রচুর অভিজ্ঞতা। যৌবনেই জীবনের ইতি চেয়েছিলেন বলেই হয়তো পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলা দেশের পাঁচটি বিভাগে এক বছর এক বছর করে পাঁচ বছর চাকরি করবেন, যাতে বাঙালি জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন। ''চাকরিতে অন্নদাশঙ্করের প্রথম নিযুক্তি হল মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। সপ্তাহ দুয়েক পরে অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার।''[১৮] এই সময়ই বড় দিনের ছুটি। অন্নদাশঙ্কর গেলেন শান্তিনিকেতনে। তাকে সঙ্গদিলেন অচিন্ত্যকুমার। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় অন্নদাশঙ্করকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীও সেই সময় শান্তিনিকেতনে। পরে আবার বহরমপুরে ফিরে *সত্যাসত্য* উপন্যাসের প্রথম খণ্ড যার যেথা দেশ শুরু করলেন বিচিত্রা পত্রিকায়। সমাপ্ত করেন *আগুন নিয়ে খেলা* উপন্যাসটি। ১৯৩১ সালে অন্নদাশঙ্কর বদলি হলেও নওগাঁতে। সেটা আবার মহকুমা শাসক রূপে। জন্ম হল প্রথম সন্তান পুণ্যশ্লোকের। সময়টা ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের। একদিকে দেশপ্রেম ও গান্ধীচিন্তার দায়, অন্যদিকে আইন রক্ষা ও কর্তব্যের দায়। এরপর বিচার বিভাগের বদলি হন অন্নদাশঙ্কর রায়। কর্মস্থল চট্টগ্রাম ১৯৩৩ সাল। এই সময়ই অজ্ঞাতবাস শেষ করেন। কতগুলি ছোটগল্প ও কবিতাও এই সময় লেখেন। কিন্তু তিন মাসেই বদলি হলেন ঢাকায়। সেখানেও 'বারোজনা' নামে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ১৯৩৪ সাল ঢাকা থেকে অন্নদাশঙ্কর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার শাসনপদে বদলি হন। এখানেই সত্যাসত্যের তৃতীয় খণ্ড *কঙ্কাবতী* লেখা শেষ করেন এবং এই বিষ্ণু পুরেই স্থির

করেন যে, ''দান্তের স্বর্গীয় মিলন, সার্ভেন্টেস এর জন্য কি গ্যেটে, গ্যেটের ফাউস্ট, টলস্টয়-এর সমর ও শান্তি প্রভৃতি বিশ্বের ধ্রুপদী সাহিত্য কীর্তিগুলি সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করবেন। সেই মতো ফাউস্ট এবং সমর ও শান্তি নিয়ে দুটি প্রবন্ধ বিষ্ণুপুরে থাকা কালেই লেখেন। এই সময় দ্বিতীয় পুত্র চিত্রকামের জন্ম হয়। অন্নদাশঙ্করের ভাষায়— ''তখন আমার ছোট ছেলে চিত্রকামের বয়স মাত্র তিন মাস। বিষ্ণুপরেই তাঁর জন্ম। লীলা আর আমি, পুণ্য ও চিত্র এই দুই শিশুকে নিয়ে যাত্রা করি দেরাদুনে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে হরিদ্বারে যাই ও সেখান থেকে হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলায়। তারপর দিল্লি, আগ্রা, মথুরা হয়ে বৃন্দাবন যাই। এখানেই শখ করে কিনি নামাবলি। ধার্মিক বলে নয়।''[১৯] এরপর ১৯৩৫ সালে নদিয়া জেলার কুষ্ঠিয়া মহকুমার শাসক হন। সেখানকার পরিবেশটা ছিল বাউল ও ফকির সংস্কৃতির সাধনা। যা অন্নদাশঙ্করের ঘুমিয়ে থাকা মরমীসত্তাকে জাগাতে সাহায্য করে। এই সময়ই পিতৃবিয়োগ। ঢেঙ্কানাল থেকে ফিরে বদলি হলেন কৃষ্ণনগরে নদিয়ার অস্থায়ী জেলা শাসক পদে। ১৯৩৭ এর মার্চ মাসে অন্নদাশঙ্কর পেলেন রাজশাহি জেলাশাসকের পদ। এই সময়ই কন্যা জয়ার জন্ম। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের সাথে নানা বিষয়ে আলাপ হয়। ছড়া তার মধ্যে অন্যতম। অন্নদাশঙ্করের নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক ঘটনাটি— ''ইতিমধ্যে একদিন টেলিগ্রাম আসে আত্রাই ঘাটে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায়। আমি তৎক্ষণাৎ মোটরে করে রওনা হয়ে যাই নাটোরে। সেখান থেকে রেলপথে আত্রাই ঘাটে। কবিগুরুকে তাঁর হাউসবোর্ট থেকে নামতে সাহায্য করি। তারপর আমরা দুজনে স্টেশনের প্লাটফর্মে দুখানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে কলকাতাগামী ট্রেনের প্রতীক্ষা করি।

শতখানেক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান তাদের প্রিয় বাবুমশায়কে বিদায় জানাবার জন্য বোটের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেটে এসেছিল। তাদের কারও কারও চোখে জল। গুরুদেব আমাকে একান্তে বলেন, 'ওরা কী বলছে, জানো? বলছে আমরা পয়গম্বরকে চোখে দেখিনি , আপনাকে দেখলুম।' তাঁর মুখে পীরের মতো দাড়ি, পরনে পীরের মতো আলখাল্লা, দেখলে পীর বলে ভ্রম হয়। পীরালি ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম। মুসলমানরা যদি তাঁকে আপনার বলে মনে করে তা হলে আশ্চর্যের কী আছে! আমি বলি, 'ওরা যা বলেছে সেটা ওদের আন্তরিক বিশ্বাস।'

ওঁর সঙ্গে আমি নাটোর পর্যন্ত ট্রেনের এক কামরায় আসি। আরোহী আমরাই দুজন। জানতে চান, ছবি আঁকি কিনা। তিনি ছবি আঁকেন। আমি ছড়া লিখি কিনা। তিনি ছড়া লেখেন। আমাকেও ছড়া লিখতে বলেন। আমি বলি, 'আমি ছড়া লিখতে পারিনে।' তখন তিনি আমাকে বলেন একটা নাটক লিখতে যে নাটক তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লিখে উঠতে পারেননি।

নাটকের বিষয়বস্তু হল অর্জুন যখন কৃষ্ণের প্রয়াণের পর তাঁর রানিদের দ্বারকা থেকে নিরাপদ

স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অরণ্যপথে মাঝখানে দস্যুরা এসে রানিদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁদের কেউ কেউ আনন্দের সঙ্গে দস্যুদের সাথী হন। তা শুনে আমি জানতে চাইলুম, 'গুরুদেব, এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বলেন, ' কেন? মহাভারতেই আছে।' তারপর হেসে বললেন, 'ওরা কিন্তু আসলে দস্যু নয়, ছদ্মবেশী প্রেমিক। আগে থেকে কথা ছিল যে পথের মাঝখানে দস্যু সেজে অপহরণ করবে।' তখন আমি ভয় পেয়ে বলি, 'গুরুদেব, আপনি যা লিখতে সাহস পেলেন না আমি তা লিখতে সাহস পাব কেন?'

নাটোরে ট্রেন থেকে নামার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, গুরুদেবের সেক্রেটারি। বললেন, 'গুরুদেব আপনাকে কেন ডেকেছেন, জানেন? জমিদারির ম্যানেজার বীরেন সর্বাধিকারী প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রার্থী। আপনি যদি এক লাইন সুপারিশ করেন তবে গুরুদেব খুশি হন।' পরে কলকাতা থেকে সুধাকান্তবাবু আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। তাতে ছিল গুরুদেবের গদ্যের সঙ্গে ছড়া।

সেদিন বাড়ি ফিরেই আমি কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত খুলে বসি। অবাক হয়ে দেখি দস্যুদের সঙ্গে রানিরা কেউ কেউ সানন্দে পলায়ন করেন। তবে সে দস্যুরা ছদ্মবেশী প্রেমিক কিনা তার কোনও উল্লেখ নেই। সেটা রবীন্দ্রভাষ্য। বিষয়টা যে নাটকের উপযোগী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লিখতে গেলে প্রাণ সংশয় হবে। তা ছাড়া সেটা মঞ্চে অভিনয় করতে দেবে কেন সরকার!

লিখতে ভুলে গেছি নদিয়ার জেলাশাসক পদে কৃষ্ণনগরে থাকতে একদিন আমার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করেন এক পুলিশ অফিসর। শহরের একটি নাট্যগোষ্ঠী 'কেদার রায়' অভিনয় করতে চান। তখনকার নিয়ম অনুসারে পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন হত। অনুমতি দেওয়ার পুলিশ, একবার নাটক কাটছাঁট করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন চাইত। কলকাতা হল পুলিশ কমিশনারের। যে পুলিশ অফিসর আমাকে তাঁর কাটা অংশগুলি দেখান তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এতে আপত্তির কী আছে? এ তো মোগল যুগের কাহিনী!' তিনি বলেন, 'না, স্যার প্রচ্ছন্নভাবে এটা রাজদ্রোহমূলক। মোগল মানে সেখানে ব্রিটিশ। ওদের মতলব, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালিকে উত্তেজিত করা।' আমি হেসে মরি। এইসব পুলিশ অফিসর সবকিছুর মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পায়। কী করি! কিছু কিছু বাদসাদ দিয়ে বাকিটা অনুমোদন না করে পারিনে। নইলে নাটকের অভিনয় পুলিশ বন্ধ করে দিত। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমি নিজে সেনসরশিপে বিশ্বাস করিনে। অথচ আমাকে দিয়েই এই অপকর্ম করানো হল।"[২০] অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ছড়া লেখার পরামর্শটা তিনি মনের ভিতরে রেখে দিলেন ভবিষ্যতের জন্য।

অন্যদিকে সেই সময় দেশে ১৯৩৫-এর নতুন ভারত আইন অনুসারে নির্বাচন হয়েছে; বাংলায় গঠিত ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ''এই সময় রাজশাহীতে এক সাম্প্রদায়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফজলুল হকের একটি গোপন চিঠি কলকাতায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যায়। মন্ত্রীসভা সন্দেহ করে যে এর পেছনে আছে হিন্দু জেলা শাসকের কারসাজি। অতঃপর রাজশাহিতে এলেন একজন শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসক আর অন্নদাশঙ্করকে বদলি করা হল চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলাশাসক রূপে। এটাকে কর্মক্ষেত্রে অবনয়ন বলে তিনি দুঃখিত হলেও এবার এখানে মাহবুব-উল-আলম, আবুল ফজল প্রমুখ উদার বিদ্বান ব্যাক্তিবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রের চেয়ে কর্মক্ষেত্রেই তখনও তাঁর মনোযোগ বেশি। অবশেষে দিন রাত্রি চাকরিতে উন্নতির জন্য চেষ্টার ফল মিলল, তাঁকে ১৯৩৯-এর গোড়ার দিকে বদলি করা হয়। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা দুটি জেলার অতিরিক্ত জেলাজজ ও দায়রা জজের পদে।''[২১]

তিনি ভাবলেন নতুন কর্মজীবন শুরুর আগে ছুটি নিয়ে সপরিবারে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত এবং এখনকার শ্রীলঙ্কার ভ্রমণে ঘুরে আসা যেতে পারে। গেলেনও সেখানে। পরিচয় হন বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সাথে। যেমন— বালগঙ্গাধর খের, লীলাবতী মুনশী, বড়োদায় সত্যব্রত মুখার্জি, মামা ওয়াড়েকর প্রমুখ। ভ্রমণের শেষে আবার ঢেঙ্কানালে, যেখানে মধ্যমপুত্র চিত্রকামের ১৯৩৯-এর ৬ মার্চ কটক হাসপাতালে মৃত্যু হয়। এই সফরের ফল অনেক পরে প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী *চেনাশোনা* গ্রন্থটি চিত্রকাম রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিকৃত করা হয়। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ অল্পকথায় বলেছেন অন্নদাশঙ্কর—

'কত-অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'[২২]

কিন্তু চিত্রকামের মৃত্যু কি অন্নদাশঙ্করের চিত্তে কোনো আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেচিল? হ্যাঁ এই মৃত্যু তাঁর জীবনে ও তাঁর সাহিত্যে মোড় বদল ঘটিয়েছিল। পালটে দিয়েছিল তাঁর জীবনদর্শন, জীবনধারা ও সাহিত্য রীতিকে। তিনি ভেবেছিলেন চাকরিটা তো শুধু জীবিকা, আর জীবন, সেতো সাহিত্য নয়। বিবাহের পূর্বেই পরিকল্পনা করেছিলেন পাঁচ বছর আই.সি.এস এর চাকরি করে সাহিত্যের সেবায় ও সৌন্দর্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন। ভাবলেন জন্মেই পাওয়া জীবন থেকে কী করে বঞ্চিত করবেন ছেলে মেয়েদেরকে। সুতরাং চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্য ভাবলেন। তবে পুত্র শোকের ট্রাজেডি যেন অন্নদাশঙ্করকে বুঝিয়ে দিল জীবনের আমূল পরিবর্তন দরকার।

আর এই পুত্রশোকের ট্রাজেডি তার প্রবন্ধের শৈলীকে অন্যমাত্রা দান করেছিল। অর্থাৎ প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। এভাবেই চলতে থাকে তাঁর একের পর এক সাহিত্য রচনা। তাঁর লেখায় উঠে আসে অমৃতের স্বাদ, সৌন্দর্যের সারাৎসার। নতুন করে বরণ করে নেন সত্যকে আর সৌন্দর্যকে। যা না হলে লেখা আর্ট হয় না। এমন ধারণা অন্নদাশঙ্করের।

পূর্বোক্ত ঘটনার বারো বছর পর তিনি কাজ কর্ম ছেড়ে দেন। সরকারি চাকরি হতে অকালে অবসর নেন। প্রথমত এতদিন দুদিকে মোমবাতি পোড়ানোর ফলে আয়ুক্ষয় হচ্ছিল। আর বেশিদিন ওভাবে চলতো না। তাঁর মনে হল সাহিত্যকে ছাড়লে তিনি কেউ নন, কিছু নন। ফলে রাজকর্মকেই ছাড়লেন। দ্বিতীয়ত চাকরি-জীবনে সব সময়েই দুই চড়াং মাঝ খান দিয়ে নৌকো চালাতে হয়েছে তাঁকে। একদিকে রিয়ালিটির আকর্ষণ, অন্যদিকে সাহিত্যের আকর্ষণ। রিয়ালিটি রেখে সাহিত্য করলে তাঁর প্রত্যয়, সাহিত্যে একটা মাঝারি উচ্চতায় ওঠা যাবে, চূড়ান্ত উচ্চতায় নয়। তাই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাহিত্যিকের জীবনকেই তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করলেন।

তবে ১৯৫১-এর আগের কিছু ঘটনা প্রাবন্ধিকের মনে দাগ কেটেছিল। যখন দেশ স্বাধীন হল চৌদ্দই আগস্ট মধ্যরাতে। চারদিকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় অন্নদাশঙ্কর ও তার পরিবারের। পনেরোই আগস্ট সকালে হাওড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক এসে তাঁকে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে চরখা-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের জন্য। উত্তোলন করেনও। তারপর আদালত ভবনে পতাকা উত্তোলনের পর্ব। এই কথাগুলোই আমরা শুনব অন্নদাশঙ্করের মুখ থেকে। *স্বাধীনতার পূর্বাভাস* যা পরবর্তী নতুন সংস্করণের নামকরণ হয়—*যুক্তবঙ্গের স্মৃতি*। এটি আমার আত্মচরিত, সই সময়ের, যে সময় আমি ছিলুম পূর্ববঙ্গে নয় বছর ও পশ্চিমবঙ্গে নয় বছর। তেমনি শাসন বিভাগে নয় বছরও বিচার বিভাগে নয় বছর।”[২৩] তিনি আরো বলেছেন— ‘‘সেই সময়টার উপর যবনিকা পড়ে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭। একই সঙ্গে শেষ হয় ব্রিটিশ আমল ও লোপ পায় যুক্তবঙ্গ। আর সেই সঙ্গে আমার ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ। কারণ সার্ভিসটাকেই ইংরেজরা গুটিয়ে নেয়। আমরা যাঁরা থেকে যাই তাঁদের পরিচয় যদিও আই.সি.এস. রূপে তবু প্রকৃত পক্ষে আমরা উচ্চতর পর্যায়ের আই.সি.এস.। ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সদস্য। আমি আমার ব্রিটিশ আমলের সার্ভিস জীবনের কথাই লিখেছি। তার আদি ও অন্ত যুক্তবঙ্গে। যুক্তবঙ্গের প্রতি আমি এক প্রকার নসটালজিয়া বোধ করি। কে না করেন? সেখানে আমরা পরাধীন ছিলুম, পরাধীনতা সুখের নয়। কিন্তু পরাধীনতাই কি একমাত্র সত্য? রাজশাহী, কুষ্ঠিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা কি ভোলা যায়? স্মৃতি সতত সুখের।”[২৪] অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৫১ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। এবং বিশ্বভারতীর কর্ম সমিতির সদস্য হন। এই সময়ই *প্রত্যয়* নামের প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫২-এর একুশে

ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে আয়োজন করেন এক ঐতিহাসিক সাহিত্য মেলা। ১৯৫৪ সালে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্য অকাদেমি। আর এই সাহিত্য অকাদেমির সংসদের সদস্য হন অন্নদাশঙ্কর। এই সময়ই তিনি *সাহিত্যে সংকট* রচনা করেন।

অন্নদাশঙ্করের কথায় উঠে আসে শান্তিনিকেতনের কথা—''শন্তিনিকেতনকে বলা যেতে পারে সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্র। এখানে সব দেশের সব ধর্মের, সব ভাষার সাহিত্য সংগীত ললিত কলা রসিকরা স্বাগত। এটা জোড়া সাঁকো ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য। বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের এই বৈশিষ্ট্য ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই সম্প্রসারণ।''[২৫] জাপান থেকে ফিরে যখন তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'জাপানে' লিখছেন তখন ১৯৫৮ সালে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়— এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'চন্দ্রগ্রহণ' এবং 'একেশ্বরবাদ' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। আবার ''পরের বছর কেরলের নির্বাচিত সরকারকে সংবিধানের ৩৫৬ সংখ্যক ধারা প্রয়োগ করে উৎখাত করা হলে মর্মাহত অন্নদাশঙ্কর তার অন্যায় দেখিয়ায় লিখলেন 'সূর্যগ্রহণ' নামে একটি প্রবন্ধ।''[২৬]

এই শান্তিনিকেতন বাসের সময়েই অসময়ের জাতিবৈরিতাকে কেন্দ্র করে ১৯৬০ সালে লেখেন *ড্রাগনের দাঁত* প্রবন্ধ। ভারত-চীন সীমান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে *যোগভ্রষ্ট*, ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে হজরতবাল নিয়ে *নক্ষত্রের আলো*, *পাণ্ডববর্জিত দেশ*, *সভ্যতার সঙ্কট: ঘরে*প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন। এই সময় ১৯৬২ তে রবীন্দ্রনাথ নামে একটি প্রবন্ধ বের হয়। যাতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক নতুন নতুন প্রবন্ধ প্রাবন্ধিক লেখেন। আবার ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সময় গৌরকিশোর ঘোষ যখন কারারুদ্ধ তাকে সাহস যোগাতে ছুটে আসেন অন্নদাশঙ্কর। এর পরেই আবার বাংলাদেশের মুজিব হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রাবন্ধিক লিখলেন *কাঁদো, প্রিয় দেশ* প্রবন্ধটি। এবং কবিতা —

''যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা
অশ্রুগঙ্গা বহমান।
তবু হবে জয়
নাহি নাহি ভয়।

জয় মুজিবর রহমান।”[২৭]

এই প্রসঙ্গে একটু বলে নেওয়া ভালো যে, অন্নদাশঙ্কর রায়, শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশের জনক বলে মানতেন। বাংলাদেশ নামটি শেখ মুজিবর রহমানেরই রাখা। সেটা অবশ্য মুক্তি যুদ্ধের পূর্বেই। ১৯৭৬-এর সময়েই লীলা রায় বাথরুমে পড়ে যায় এবং উরুদেশের হাড় ভেঙে যায়। ‘‘অপারেশন করে লীলা রায়ের ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো হল। সার্জন বললেন জোড়া দেওয়া হাড়ের অবস্থা মাঝে মাঝে দেখতে হবে তাঁকে। সে জন্য রোগিনীর কলকাতায় বাস করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর শুরু হল অন্নদাশঙ্করের কলকাতা বাস।”[২৮]

১৯৭৩-এর ঘটনা পর্বে অন্নদাশঙ্করের সত্তর বছর বয়স উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সমিতির প্রচলন করেন এবং মঙ্গলাচরণ করেন ড. রমা চৌধুরী। সমিতির স্মারক গ্রন্থের জন্য প্রাবন্ধিক নিজের জীবনদর্শনের কথা শোনান—

‘‘মানুষকে হিন্দু বা খ্রীস্টান বা মুসলমান বলে বোঝানো যায় না। মানুষের ধর্ম কয়েকখানি শাস্ত্রে নিবদ্ধ নয়। কর্মের অভিজ্ঞতা একটি নিত্য প্রবহমান অভিজ্ঞতা। বহতা নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলেছে রসতাসাধু। বেদ বাইবেল কোরানকে ছাড়িয়ে গেছে মানুষের ধর্মোপলব্ধি। শাস্ত্র পড়ে বা মন্দিরে মসজিদে গির্জায় গিয়ে কতটুকু ধর্মোপলব্ধি হয়? জীবন্ত মানুষের সঙ্গে মিশে হয় তার চেয়ে বেশী। সব দেশের সব ধর্মের মানুষের কাছে আমি পেয়েছি তিলতিল করে আমার সত্য। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমার নিজের নিভৃত উপলব্ধি। ... জীবন দেবতার কাছে জীবন ভর আমি যে তিনটি বর চেয়েছি তার প্রথমটি হলো ইলুমিনেশন। আমার অন্তর যেন আলোয় ভরে যায়। বিশ্বরহস্য যেন আমি সেই আলো দিয়ে ভেদ করতে পারি। সমস্ত যেন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হলো প্রেম। আমার সত্তা, আমার হৃদয় যেন সুধারসে ভরে যায়। আমি যেন রসের আস্বাদন পাই ও দিই। আমার প্রেম সকলের প্রতি প্রসারিত হয়, সকলের মধ্যে যিনি ঊর্ধ্বে তাঁর সমীপে পৌঁছায়। তৃতীয়টি হলো সৃষ্টির আনন্দ বেদনা। আমিও যেন কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারি। বিশ্বস্রষ্টা আমাকেও যেন তাঁর সৃষ্টি শক্তির একটি কণা দেন। তাই দিয়ে আমিও যেন সৃষ্টি করতে পারি আমারও একটি ছোটখাটো জগৎ। ... আমার সৃষ্টির কাজ যেন সম্পূর্ণ করে যেতে পারি।”[২৯] এভাবেই প্রাবন্ধিক ঈশ্বরের কাছে সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকণা প্রার্থনা করেছেন। যাতে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। ফলে সমসাময়িক ঘটনাগুলিই তাঁর সৃষ্টির উপকরণ হয়ে উঠেছে। করেছেন সৃষ্টিও। ১৯৭৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির শুরু থেকেই সভাপতি। নব্বই-এর দশকে রাজীবগান্ধীর মৃত্যু এবং বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে— একাধিক ছড়া ও প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৯১ সালে *বিনুর বই*-এর দ্বিতীয় পর্ব লেখা শুরু করেন। বীরভূমের

জজ থাকা কালীন সময়েই *বিনুর বই*-এর প্রথম পর্বে তাঁর শিল্পী সত্তার বিকাশের কাহিনী লেখেন। দ্বিতীয় পর্বের লেখা শেষ হয় ১৯৯৩ এর জুন মাসে। বিনুর বই-এর দ্বিতীয় পর্বের মূল বিষয় বস্তু হল— ''এক-একটি দীর্ঘতর পরিচ্ছেদে তাঁর ছাত্র-জীবন ও কর্মজীবনের কাহিনী এবং তার পরে তার শান্তিনিকেতন বাস থেকে কলকাতাবাসের বৃত্তান্ত- আর তাঁর বাষট্টি বছরের সঙ্গিনীর বিদায়— বেদনা থেকে উপলব্ধি জীবন দর্শন ও নিশ্চয়তাবোধের ব্যাখ্যা। আর এসবের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে তাঁর মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের কাহিনী।''[৩০]

অন্নদাশঙ্করের কথাতেই শোনা যাক—*বিনুর বই*- এর দ্বিতীয় পর্ব লেখার ইতিহাস— ''অবশেষে দ্বিতীয় পর্বে যখন হাত দিলুম তখন আমার বয়স ছিয়াশি বছর। তখন আমি সূর্যাস্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। শরীর অপটু। মন অবসন্ন। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ ভেবেচিন্তে লিখতে হয়েছে, একটানা লিখে যেতে পারিনি। মাঝে মাঝে বিরত থেকেছি। স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য নয় তাই বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তার জন্যে আমি দুঃখিত। 'জীবনদর্শন' শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময় আমার জীবনসঙ্গিনীর প্রয়াণ। চিন্তা ও লেখায় ছেদ পড়ে যায়। যাইহোক কোনরকমে শেষ করা গেল। উনি আমাকে বলেছিলেন, 'এবার তুমি একটি Summing Up লেখ। যেমন লিখেছিলেন সমরসেট মহম।'' আমারও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু লিখতে লিখতে দেখা গেল ঠিক সেই জিনিসটি হয়নি। যা হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এখন আমি নব্বইতে পড়েছি। এ বয়সে এর চেয়ে ভালো আশা করা যায় না। তবে কিছু কথা বাকি রয়ে গেল। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে সক্ষম।''[৩১] বিনুর বই'য়ের প্রথম পর্ব থেকে কিছু কিছু উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হল। যাতে করে তাঁর জীবন দর্শনের মূল স্বরূপটি অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

ক. ''জীবিকাকে জীবন্ত করে ধর্ম। জীবিকাকে জীবন্যাস করে ধর্মবিশ্বাস।''[৩২]

খ. ''কবিতার প্রাণ হচ্ছে কবিত্ব। প্রাণ যদি না থাকে তবে সামাজিক তাৎপর্য আছে বলেই তা কবিতা নয়। তা কবিতার ভান।''[৩৩]

গ. 'বিনু প্রেরণায় বিশ্বাস করে।'[৩৪]

ঘ. ''পূর্ণ সত্য দূরের কথা' আংশিক সত্যকেও যাঁরা সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁরা লিখতে লিখতে আসলটি হারিয়ে ফেলেছেন, জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করেছেন কাল্পনিককে।''[৩৫]

ঙ. ''সাহিত্যের সত্য দর্শন বিজ্ঞানের সত্য নয়। কারণ সাহিত্যের সত্য কল্পনায় মিশ্রিত। দর্শনবিজ্ঞানের সত্য কল্পনা বর্জিত।''[৩৬]

চ. ''পরবর্তী জীবনে বিনুর ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল করেছে; কিন্তু প্রেমে

বিশ্বাস অটল রয়েছে। প্রেমে বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় একে একে দৃঢ় হয় আর্টে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস। শক্তি সবচেয়ে প্রেমেরই বেশি। বিনু তার সাক্ষী।"[৩৭] অর্থাৎ বিনুর বই দ্বিতীয় পর্বে লেখার ভঙ্গি বা শৈলী অন্য ধরনের। বিষয় অর্ন্তমুখী থেকে বর্হিমুখী হল, সাহিত্যিক জীবনের কাহিনী হল। এই গ্রন্থ লেখার মধ্যেই স্ত্রী লীলা রায়ের মৃত্যু জীবনকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

এরপর বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্নদাশঙ্কর তাঁর পাশে দাঁড়ান, এবং রক্ষা করেন। এরপর একে একে বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদ ও আকাদেমি থেকে পান নানা সম্মান ও পুরস্কার। অবশেষে অন্নদাশঙ্কর ১৯৯৯ সালে ১৫ নভেম্বর জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু বেঁচে গেলেন। তারপর ২০০২ সালে অবশেষে ২৮ অক্টোবর বেলা তিনটে তিরিশ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। এখানে অন্নদাশঙ্কর রায়ের আই.সি.এস. জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি তালিকা দেওয়া হল। যাতে করে বোঝা যাবে তাঁর জীবন প্রবাহ কোন কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

| | |
|---|---|
| ১৯২৯ অক্টোবর | আমার I.C.S. জীবন শুরু। |
| ১৯২৯ ডিসেম্বর | লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব। |
| ১৯৩০ | লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। |
| ১৯৩১ | গান্ধী আরউইন চুক্তি। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীজী। |
| ১৯৩২ | আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ। |
| ১৯৩৩ | সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। পাকিস্তান শব্দটির সৃষ্টি। |
| ১৯৩৫ | নতুন ভারত শাসন আইন। মুসলিম লীগে জিন্না অধিনায়ক। |
| ১৯৩৭ | প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রীমণ্ডলী। |
| ১৯৩৯ | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ। কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ। |
| ১৯৪০ | মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব। |
| ১৯৪০ | ব্যক্তি সত্যাগ্রহ আরম্ভ। |
| ১৯৪২ | অগাস্ট আন্দোলন। |
| ১৯৪৩ | বাংলায় মন্বন্তর। ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। |
| ১৯৪৫ | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। |
| ১৯৪৬ | মুসলিম লীগের ডাইরেকট অ্যাকশন শুরু। কেন্দ্রে ইনটারিম গভর্নমেন্ট |
| ১৯৪৭ | ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ। দেশভাগ, প্রদেশভাগ ও ভারত-পাকিস্তানের |

স্বাধীনতা। দেশীয় রাজ্য বিলোপ।

আমার I.C.S. জীবন শেষ। এর পরে I.A.S. জীবন, I.C.S.-এর জের। (অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪)

তাঁর ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় সমসাময়িক ঘটনা, দেশ বিদেশের খবরা খবর, বিভিন্ন মনীষীর সাথে সাক্ষাৎ; জীবনকে করে তুলেছিল বৈচিত্র্যময়। ফলে বৈচিত্র্যময় জীবনকে কেন্দ্র করেই তিনি রচনা করেছেন একের পর এক প্রবন্ধ। প্রবন্ধেও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। প্রাবন্ধিকের মনে বারবার প্রশ্ন আসতো কাদের জন্যে লিখব? কিসের জন্যে লিখব? সৃষ্টি করবেন কেন? প্রাবন্ধিক বলেছেন মানব কল্যাণের জন্য, কেউ আবার মতবাদ প্রচারের জন্য, কেউ সমাজ সংস্কার বা সমাজ বিপ্লবের জন্য, কেউ নৈতিক উন্নয়নের জন্য। কেউ দেশ উদ্ধারের জন্য। কেউ লোকশিক্ষার জন্য রম্যাঁ রলা প্রাবন্ধিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, কখনো যেন টাকার জন্য না লিখে। প্রাবন্ধিক তাঁর সেই উপদেশ মেনেও নিয়েছিলেন। এবং ঊনবিংশ শতকের শেষপাদের ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন আর্টের জন্যই আর্ট।

আবার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির যে একটি পরস্পরাগত সম্পর্ক রয়েছে, সেটা প্রাবন্ধিকের কাছে সত্য। ''প্রেরণার জন্যে আমি কখনো ফিরে তাকাতুম অতীতের দিকে। যে অতীত স্বদেশের অতীত। আবার কখনো দৃষ্টিপাত করতুম পশ্চিমের দিকে। যে পশ্চিম স্বযুগের ভাবকেন্দ্র। সেই বারো বছর বয়স থেকেই আমি সাগরপারের স্বপ্ন দেখি। আমার উপনয়ন গায়ত্রী মন্ত্রে হয়নি। হয়েছে আর্ট মন্ত্রে। সাগর পারেই তো তার আধুনিকতম বিকাশ।''[৩৮] তিনি বারবার বলতে চেয়েছেন এমন ভাবে বাঁচতে হবে এবং কাজ করে যেতে হবে যাতে শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে সরে না গিয়ে মানবিক আদর্শের অনুসরণ করা যায়। তিনি হতে চান মানবিকবাদী। তিনি সৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পান আনন্দ। তাই তিনি কখনোই পলায়ণবাদী হতে চাননা। তিনি চান লেখকদের স্বাধীনচেতা এবং একের পর এক সৃষ্টি। এভাবেই তাঁর ব্যক্তি জীবনের ঘটনা, অভিজ্ঞতা প্রবন্ধের উপকরণ যুগিয়েছে। প্রবন্ধ কখনো পত্রের আকার, কখনো সাক্ষাৎকারের আকার নিয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে, যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব ও তথ্যের অপূর্ব মিশ্রণ। পাশাপাশি-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস।

**তথ্যসূত্র:**

১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩,

পৃ. ১৬৬

২. ঐ, - পৃ. ১৬৭

৩. ঐ, - পৃ. ১৬৭

৪. ঐ, - পৃ. ১৬৭

৫. ঐ, - পৃ. ১৬৭

৬. ঐ, - পৃ. ১৬৭

৭. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭, পৃ. ২৪৪

৮. দাশগুপ্ত ধীমান - চিরহরিৎ বৃক্ষ অন্নদাশঙ্কর, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৮

৯. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ৬

১০. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৮৮

১১. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ৪

১২. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৯৪

১৩. ঐ, - পৃ. ১৯৪

১৪. ঐ, - পৃ. ১৯৪

১৫. ঐ, - পৃ. ১৯৫

১৬. ঐ, - পৃ. ২০৯

১৭. দাশগুপ্ত ধীমান - চিরহরিৎ বৃক্ষ অন্নদাশঙ্কর, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ,

ফেব্রুয়ারি, পৃ. ১১

১৮. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ১১

১৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১১

২০. ঐ, - পৃ. ২৪৫-৪৬

২১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১৪

২২. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৭, পৃ. ১৪

২৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯, পৃ. ৩৩৯

২৪. ঐ, - পৃ. ৩৩৯

২৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৩৫

২৬. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ২৪

২৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৪০৯, পৃ. ১৯৯

২৮. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ২৫

২৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র

ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ.১০৬

৩০. দাশগুপ্ত সুরজিৎ - অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ২৯

৩১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১৬

৩২. ঐ, - পৃ. ৪৩

৩৩. ঐ, - পৃ. ৪৯

৩৪. ঐ, - পৃ. ৫১

৩৫. ঐ, - পৃ. ৫৪

৩৬. ঐ, - পৃ. ৫৫

৩৭. ঐ, - পৃ. ৬৩

৩৮. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১০০